সূরা আল-আহযাব:৫ম রুকু (৩৫-৪০)আয়াত

Sistersforum in islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ الۡمُسۡلِمِیۡنَ وَ الۡمُسۡلِمٰتِ وَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ وَ الۡمُؤۡمِنٰتِ وَ الۡقٰنِتِیۡنَ وَ الۡقٰنِتٰتِ وَ الصّٰدِقِیۡنَ وَ الصّٰدِقٰتِ ৩৩ : ৩৫
وَ الصّٰبِرِیۡنَ وَ الصّٰبِرٰتِ وَ الۡخٰشِعِیۡنَ وَ الۡخٰشِعٰتِ وَ الۡمُتَصَدِّقِیۡنَ وَ الۡمُتَصَدِّقٰتِ وَ الصَّآئِمِیۡنَ وَ الصّٰٓئِمٰتِ وَ
الۡحٰفِظِیۡنَ فُرُوۡجَهُمۡ وَ الۡحٰفِظٰتِ وَ الذّٰکِرِیۡنَ اللّٰهَ کَثِیۡرًا وَّ الذّٰکِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمۡ مَّغۡفِرَۃً وَّ اَجۡرًا عَظِیۡمًا

৩৫. নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সওম পালনকারী পুরুষ সওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।

পিছনের প্যারাগ্রাফের পরপরই এ বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে এই মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ওপরে রসূলের ﷺ পবিত্র স্ত্রীগণকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা কেবলমাত্র তাঁদের জন্যই নির্দিষ্ট নয় বরং মুসলিম সমাজের সামগ্রিক সংশোধন কাজ সাধারণভাবে এসব নির্দেশ অনুযায়ীই করতে হবে।

একদা উম্মে সালামা এবং অন্যান্য সাহাবী মহিলাগণ বললেন যে, কি ব্যাপার, আল্লাহ তাআলা সর্বস্থানে মহিলাদেরকে ছেড়ে কেবল পুরুষদেরকেই সম্বোধন করেন। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হল। (মুসনাদ আহমদ, ৬/৩০১, তিরমিযী ৩২১১নং)

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ “কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদের কথা উল্লেখ করেছেন, আর আমরা স্ত্রীলোক, আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন?" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেনঃ “একদিন আমি আমার ঘরে বসে আমার মাথার যত্ন করছিলাম এমন সময় মিম্বর হতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি আমার চুলগুলো ঐ অবস্থায় জড়িয়ে নিলাম এবং কক্ষে বসে তার কথাগুলো শুনতে লাগলাম। ঐ সময় তিনি মিম্বরে পাঠ করছিলেনঃ (আরবি) অর্থাৎ “হে লোক সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেনঃ অবশ্য আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারিণী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিনা নারী।” (হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদের বর্ণনা করেছেন। অন্য ধারায় ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন) একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, কতিপয় স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এ কথা বলেছিলেন।আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, স্ত্রীলোকেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর স্ত্রীদেরকে একথা বলেছিলেন।

এতে মহিলাদের মন জয় করা হয়েছে। তাছাড়া সকল আহ্‌কামে পুরুষদের সাথে মহিলারাও শামিল, শুধু তাদের কিছু বিশেষ আহকাম ছাড়া যা তাদেরই জন্য নির্দিষ্ট। এই আয়াত ও অন্যান্য আয়াতসমূহ দ্বারা

পরিষফুটিত হয় যে, ইবাদত ও আল্লাহর আনুগত্য এবং পরকালের মান-মর্যাদায় পুরুষ ও নারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের জন্য একই ভাবে সে ময়দান খোলা আছে এবং উভয়েই বেশি বেশি নেকী ও সওয়াব অর্জন করতে পারে। কেবল জাতিভেদে তাদের মাঝে কোন কম-বেশি করা হবে না। এ ছাড়া মুসলমান ও মুমিনের পৃথক পৃথক বর্ণনা করাতে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, এই দুই-এর মাঝে পার্থক্য আছে। ঈমানের স্থান ইসলামের ঊর্ধ্বে; যেমন কুরআন ও হাদীসের অন্যান্য দলীল দ্বারা তাই প্রমাণ হয়।

মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী ---যারা নিজেদের জন্য ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এখন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে এ বিধানের অনুসারী হবার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছে। অন্য কথায়, যাদের মধ্যে ইসলাম প্রদত্ত চিন্তাপদ্ধতি ও জীবনধারার বিরুদ্ধে কোন রকমের বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতার লেশমাত্র নেই। বরং তারা তার পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের পথ অবলম্বন করেছে।

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী ----যাদের এ আনুগত্য নিছক বাহ্যিক নয়, গত্যন্তর নেই, মন চায় না তবুও করছি, এমন নয়। বরং মন থেকেই তারা ইসলামের নেতৃত্বকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে। চিন্তা ও কর্মের যে পথ কুরআন ও মুহাম্মাদ ﷺ দেখিয়েছেন সেটিই সোজা ও সঠিক পথ এবং তারই অনুসরণের মধ্যে আমাদের সাফল্য নিহিত, এটিই তাদের ঈমান। যে জিনিসকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভুল বলে দিয়েছেন তাদের নিজেদের মতেও সেটি নিশ্চিতই ভুল। আর তাকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ সত্য বলে বলে দিয়েছেন তাদের নিজেদের মন-মস্তিষ্কও তাকেই সত্য বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে। তাদের চিন্তা ও মানসিক অবস্থা এমন নয়। কুরআন ও সুন্নাত থেকে যে হুকুম প্রমাণিত হয় তাকে তারা অসঙ্গত মনে করতে পারে এবং এ চিন্তার বেড়াজালে এমনভাবে আটকে যেতে পারে যে, কোন প্রকারে তাকে পরিবর্তিত করে নিজেদের মন মাফিক করে নেবে অথবা দুনিয়ার প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তাকে ঢালাইও করে নেবে আবার এ অভিযোগও নিজেদের মাথায় নেবে না যে, আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম কাটছাঁট করে নিয়েছি। হাদীসে নবী ﷺ ঈমানের সঠিক অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً

"ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করেছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে তার রব, ইসলামকে তার দ্বীন এবং মুহাম্মাদকে তার রসূল বলে মেনে নিতে রাজি হয়ে গেছে।" (মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে তিনি এর ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا جِئْتَ بِهِ

"তোমাদের কোন ব্যক্তি মু' মিন হয় না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমি যা এনেছি তার অনুগত হয়ে যায়।" (শারহুস সুন্নাহ)

ইসলাম ও ঈমানকে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, এর দ্বারা তো প্রমাণিত হচ্ছে যে, ঈমান ইসলাম হতে পৃথক এবং ঈমান ইসলাম হতে বিশিষ্টতর। কেননা, মহান আল্লাহ বলেনঃ

(আরবি) অর্থাৎ “আরব মরুবাসীরা বলেঃ আমরা ঈমান আনলাম। (হে মুহাম্মাদ সঃ) তুমি বলঃ তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বলঃ আমরা আত্মসমর্পণ করেছি। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি। সূরা হুজুরাত:১৪)

ইসলাম ও ঈমানের পার্থক্য

সূরা আয-যারিয়াতে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন: ﴿فَأَخۡرَجۡنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣٥ فَمَا وَجَدۡنَا فِيهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ مِّنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٦﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦]

“অতঃপর সেখানে যারা মুমিন ছিল, আমরা তাদেরকে বের করে নিয়ে আসলাম, তবে একটি বাড়ি ব্যতীত সেখানে কাউকে আমরা মুসলিম পাই নি”। [সূরা আয-যারিয়াত: ৩৫-৩৬]

যখন ইসলাম কিংবা ঈমান পৃথক উল্লেখ করা হয়, তখন অর্থ পুরো দীন ইসলাম, ঈমান ও ইসলামের অর্থে কোনো পার্থক্য থাকে না, যখন উভয় একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়, তখন ঈমান অর্থ হয় অভ্যন্তরীণ আমল, যেমন আল্লাহর প্রতি ঈমান, আল্লাহর মহব্বত, ভয়, আশা ও তার প্রতি একনিষ্ঠতা। আর ইসলাম অর্থ হয় বাহ্যিক আমল, অভ্যন্তরীণ ঈমান থাক বা না-থাক, যেমন দুর্বল মুসলিম বা মুনাফিকের আমল। মুনাফিকের মাঝে বাহ্যিক আমল ইসলাম থাকে; কিন্তু অভ্যন্তরীণ আমল ঈমান থাকে না।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন: “ঈমান কখনো ইসলাম ও নেক আমল থেকে পৃথক উল্লেখ করা হয়, কখনো একত্র উল্লেখ করা হয়, যেমন হাদীসে জিবরীলে এসেছে: (ما الإسلام ...وما الإيمان) ইসলাম কী, ঈমান কী? অনুরূপ আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿قَالَتِ ٱلۡأَعۡرَابُ ءَامَنَّاۖ قُل لَّمۡ تُؤۡمِنُواْ وَلَٰكِن قُولُوٓاْ أَسۡلَمۡنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلۡإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمۡۖ ١٤﴾ [الحجرات: ١٤]

“বেদুঈনরা বলল, ‘আমরা ঈমান আনলাম’। আপনি বলুন, ‘তোমরা ঈমান আন নি’; বরং তোমরা বল, ‘আমরা আত্মসমর্পণ করলাম’। আর এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নি” [সূরা আল-হুজুরাত: ১৪]

অভ্যন্তরীণ আনুগত্য যেমন অন্তরের বিশ্বাস ও তার আমল, যা একমাত্র মুমিন থেকেই প্রকাশ পায়, আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡهِمۡ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِيمَٰنٗا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ٢ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ حَقّٗاۚ ٤﴾ [الانفال: ٢، ٤]

“মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের ওপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মুমিন”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২-৪] এ হিসেবে ঈমানের মর্যাদা উঁচু, কারণ প্রত্যেক মুমিন মুসলিম, কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম মুমিন নয়”।মাজমু ‘ ফতোয়া ও রাসায়েল লি ইবন উসাইমীন: ৪/৯২

‘হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না’ (আলে ইমরান ৩/১০২)। এখানে তিনটি বিষয় এসেছে, মুমিন, মুত্তাক্বী ও মুসলিম। প্রথম দু’টি হৃদয়ে বিশ্বাসগত কমবেশীর সাথে সম্পর্কিত এবং শেষেরটি বাহ্যিক আমলের সাথে সম্পর্কিত।

আলে ইমরান ১০২ আয়াতে মুমিনদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা ইসলামের বিধি-বিধান সমূহ পরিপূর্ণভাবে পালন কর, যেন এর উপরেই তোমরা মৃত্যুবরণ করতে পার’ (ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)। ঈমানের কমবেশীর বিষয়টি আল্লাহ দেখবেন।

দ্বীনের স্তর হচ্ছে তিনটি : (১) ঈমান, যা ছয়টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর উপরে বিশ্বাস, ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, নবী ও রাসূলগণ, ক্বিয়ামত দিবস এবং তাক্বদীরের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। (২) ইসলাম, যা পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। কালেমা শাহাদত, ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জ। (৩) ইহসান, যা একনিষ্ঠচিত্তে ও পূর্ণ ইখলাছের সাথে আল্লাহর ইবাদত করাকে বুঝায়। অর্থাৎ এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন বান্দা আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে অথবা আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে দেখছেন। পূর্ণ ঈমানের সাথে সকল প্রকার সৎকর্ম ইসলাম ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আর সেগুলি পূর্ণ ইখলাছের সাথে সম্পাদন করা ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। এটিই হ’ল দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর। উল্লিখিত তিনটি বিষয় হাদীছে জিব্রীলে বর্ণিত হয়েছে (বুখারী হা/৫০, মুসলিম হা/৯; মিশকাত হা/২)।

লূত আলাইহিস সালামের পরিবারকে একবার মুমিন ও দ্বিতীয়বার মুসলিম বলা হয়েছে। এতে ইসলাম অর্থ বাহ্যিক ইসলাম, ঈমান অর্থ অভ্যন্তরীণ ঈমান। আল্লাহ তা ‘আলা লূত আলাইহিস সালামের পরিবারভুক্ত সবাইকে মুসলিম বলেছেন, যার শামিল তার স্ত্রীও, সে ইসলাম যাহির করে অভ্যন্তরীণভাবে কুফুরি গোপন করে ছিল, তাই আল্লাহ যখন নাজাতপ্রাপ্তদের সম্বোধন করেছেন, তখন মুমিন বলেছেন:

﴿فَأَخۡرَجۡنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٣٥ فَمَا وَجَدۡنَا فِيهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ مِّنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٦﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦]

“অতঃপর সেখানে যারা মুমিন ছিল, আমরা তাদেরকে বের করে নিয়ে আসলাম, তবে আমরা সেখানে একটি বাড়ি ব্যতীত কাউকে মুসলিম পাই নি”। [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৩৫-৩৬]

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন: “লূতের স্ত্রী ছিল মুনাফিক, কুফুরি গোপন করত, তবে স্বামীর সাথে বাহ্যিকভাবে মুসলিম ছিল, তাই তার কওমের সাথে তাকেও শাস্তি দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যারা বাহ্যিকভাবে মুসলিম ছিল; কিন্তু অন্তরে কুফুরি লালন করেছে তাদের অবস্থাও তথৈবচ”।জামেউল মাসায়েল: ৬/২২১

ঈমানের সাথে যখন আল্লাহ ইসলাম উল্লেখ করেছেন, তখন ইসলাম অর্থ বাহ্যিক আমল, যেমন শাহাদাতের কালিমার সাক্ষ্য, সালাত, যাকাত, সিয়াম ও হজ। আর ঈমান অর্থ অভ্যন্তরীণ বিষয়, যেমন আল্লাহর প্রতি ঈমান, মালায়েকা, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও পরকাল দিবসের ওপর ঈমান। আবার যখন ইসলাম থেকে ঈমান পৃথক উল্লেখ করা হয়, তখন ঈমান ইসলাম ও আমলকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন, ঈমানের শাখা-প্রশাখার হাদীসে এসেছে,

«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ، بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»

"ঈমানের সত্তর উর্ধ্ব অথবা ষাট উর্ধ্ব শাখা রয়েছে, সবচেয়ে উত্তম শাখা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' , সবচেয়ে নিম্নস্তরের শাখা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু হটানো এবং লজ্জাও ঈমানের শাখা" । সহীহ মুসলিম,৩৭

অনুরূপ যেসব হাদীসে নেক আমলকে ঈমানের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে, সেখানে ঈমান অর্থ ইসলাম ও ঈমান উভয়, অর্থাৎ পুরো দীনে ইসলাম" ।মাজমুউল ফতোয়া: ৭/১৩-১৫, সংক্ষিপ্ত।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ ইবন উসাইমীন রহ. বলেন: "যখন ইসলাম ও ঈমান যৌথভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন ইসলাম অর্থ হয় বাহ্যিক আমল এবং ঈমান অর্থ হয় অভ্যন্তরীণ আনুগত্য। বাহ্যিক আমল যেমন মুখের কথা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল, যা পূর্ণ মুমিন ও দুর্বল মুমিন উভয় শ্রেণি থেকে প্রকাশ পায়

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময় মুমিন থাকে না। আবার এ বিষয়ের উপর সবাই একমত যে, ব্যভিচার দ্বারা মানুষ প্রকৃত কাফের হয়ে যায় না।

<u>অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী---</u> তারা নিছক মেনে নিয়ে বসে থাকার লোক নয়। বরং কার্যত আনুগত্যকারী।

অনুগত (আল-কানিত) শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য

ইসলামী পরিভাষায় "অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী"-র মূল আরবি শব্দটি হলো 'আল-কানিতীন' (الْقَانِتِينَ) এবং 'আল-কানিতাত' (الْقَانِتَاتِ)। নিচে এর শাব্দিক অর্থ ও গভীর তাৎপর্য বিশদভাবে আলোচনা করা হলো:

১. শাব্দিক অর্থ (Literal Meaning)আরবি 'কুনুত' (قُنُوت) শব্দ থেকে এটি এসেছে। এর মূল শাব্দিক অর্থ হলো:

অবিচল বাধ্যতা: কোনো শর্ত ছাড়া সর্বদা আদেশ মেনে চলা।

অনড় ও শান্ত থাকা: ইবাদতে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ও স্থির হওয়া।

নীরবতা ও বিনয়: আল্লাহর সামনে পরম বিনয়ের সাথে অহংকারহীনভাবে দাঁড়ানো।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে সালাতের মধ্যে সাধারণ কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ করার পর এই শব্দটি ইবাদতে পূর্ণ মনোযোগ ও নীরবতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

২. গভীর তাৎপর্য (Deep Significance)

কুরআন ও তাফসীরের আলোকে এই 'আনুগত্যের' গভীরতা সাধারণ বাধ্যতার চেয়ে অনেক ওপরে। এর প্রধান তাৎপর্যগুলো হলো:

স্বতঃস্ফূর্ত ও স্থায়ী ভালোবাসা: ইসলামের পরিভাষায় 'কানেত' বা অনুগত কেবল সে-ই নয় যে ভয়ে বা চাপে পড়ে নিয়ম মানে। বরং তিনি, যিনি আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মহব্বত থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং স্থায়ীভাবে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেন।

সর্বাবস্থায় অবিচলতা (Consistency): সুসময় হোক কিংবা কঠিন পরীক্ষা—সব পরিস্থিতিতেই আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে হুকুম পালন করে যাওয়া অনুগত বান্দাদের প্রধান লক্ষণ।

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিনয় (Humility): কেবল রুকু-সেজদা করাই আনুগত্য নয়, বরং মনের ভেতর থেকে আল্লাহর عظمت বা মহানুভবতা অনুভব করে নিজের অহংকারকে পুরোপুরি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া।

লিঙ্গভেদে সমান মর্যাদা: সূরা আল-আহযাবের এই আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর দরবারে আধ্যাত্মিক ও আত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মাঝে কোনো বৈষম্য নেই। পুরুষ যেভাবে নিজের ভেতরের অহংকার ভেঙে অনুগত হতে পারে, নারীও ঠিক একইভাবে আল্লাহর প্রিয় ও অনুগত বান্দা হতে পারে এবং উভয়ের জন্যই সমান প্রতিদান রয়েছে।

তাদের অবস্থা এমন নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যে কাজের হুকুম দিয়েছেন তাকে সত্য বলে মেনে নেবে, ঠিকই কিন্তু কার্যত তার বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন নিজেরা আন্তরিকভাবে সেগুলোকে খারাপ মনে করবে কিন্তু নিজেদের বাস্তব জীবনে সেগুলোই করে যেতে থাকবে।

“আরও দৃষ্টান্ত পেশ করেন ইমরান-কন্যা মারইয়ামের—যে তার লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করেছিল, ফলে আমরা তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম আমাদের রূহ হতে। আর সে তার রবের বাণী ও তার কিতাবসমূহ সত্য বলে গ্রহন করেছিল এবং সে ছিল অনুগতদের অন্যতম। সূরা আত-তাহরীম: ১২

<u>সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী----</u>নিজেদের কথায় যেমন সত্য তেমনি ব্যবহারিক কার্যকলাপেও সত্য। মিথ্যা, প্রতারণা, অসৎ উদ্দেশ্য, ঠগবৃত্তি ও ছলনা তাদের জীবনে পাওয়া যায় না। তাদের বিবেক যা সত্য বলে জানে মুখে তারা তাই উচ্চারণ করে। তাদের মতে যে কাজ ঈমানদারীর সাথে সত্য ও সততা অনুযায়ী হয় সে কাজই তারা করে। যার সাথেই তারা কোন কাজ করে বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারীর সাথে করে।

সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১১৯ আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।"

সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৯৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬০৭হাদিসের বাণী:

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:"তোমরা অবশ্যই সত্য অবলম্বন করবে। কারণ সত্য মানুষকে পুণ্য ও সততার দিকে পরিচালিত করে, আর পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। কোনো ব্যক্তি যখন সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্যের খোঁজে থাকে, তখন আল্লাহর দরবারে তাকে 'সিদ্দীক' (মহা সত্যবাদী) হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়..."

ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী-----আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত সোজা সত্য পথে চলার এবং আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার পথে যে বাঁধাই আসে, যে বিপদই দেখা দেয়, যে কষ্টই সহ্য করতে হয় এবং যে সমস্ত ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়, দৃঢ়ভাবে তারা তার মোকাবিলা করে। কোন প্রকার ভীতি, লোক ও প্রবৃত্তির কামনার কোন দাবী তাদেরকে সোজা পথ থেকে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয় না।

বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী----তারা দম্ভ, অহংকার ও আত্মম্ভরীতামুক্ত। তারা এ সত্যের পূর্ণ সচেতন অনুভূতি রাখে যে, তারা বান্দা এবং বন্দেগীর বাইরে তাদের কোন মর্যাদা নেই। তাই তাদের দেহ ও অন্তরাত্মা উভয়ই আল্লাহর সামনে নত থাকে। আল্লাহ ভীতি তাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে থাকে। আত্ম অহমিকায় মত্ত আল্লাহভীতি শূন্য লোকদের থেকে যে ধরনের মনোভাব প্রকাশিত হয় এমন কোন মনোভাব কখনো তাদের থেকে প্রকাশিত হয় না। আয়াতের বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায়, এখানে এ সাধারণ আল্লাহভীতি মূলক মনোভাবের সাথে বিশেষ ভাবে ‘‘খুশু’’ বা বিনত হওয়া শব্দ ব্যবহার করায় এর অর্থ হয় নামায। কারণ এরপরই সাদকাহ ও রোযার কথা বলা হয়েছে।

দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী----কেবল ফরয যাকাত আদায় করাই নয় বরং সাধারণ দান-খয়রাতও এর অন্তর্ভুক্ত। তারা আল্লাহর পথে উন্মুক্ত হৃদয়ে নিজেদের অর্থ ব্যয় করে। আল্লাহর বান্দাদের সাহায্য করার ব্যাপারে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালাতে কসুর করে না। কোন এতিম, রুগ্ন, বিপদাপন্ন, দুর্বল, অক্ষম, গরীব ও অভাবী ব্যক্তি তাদের লোকালয়ে তাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। আর আল্লাহর দ্বীনকে সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে তারা কখনো কার্পণ্য করে না।

সওম পালনকারী পুরুষ সওম পালনকারী নারী-----ফরয ও নফল উভয় ধরনের রোযা এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী----এর দু’টি অর্থ হয়। একটি হচ্ছে, তারা যিনা থেকে দূরে থাকে এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তারা উলংগতাকে এড়িয়ে চলে। এই সাথে এটাও বুঝে নিতে হবে যে, কেবলমাত্র মানুষের পোশাক না পরে উলংগ হয়ে থাকাকে উলংগতা বলে না বরং এমন ধরনের পোশাক পরাও উলংগতার অন্তর্ভুক্ত, যা এতটা সূক্ষ্ম হয় যে, তার মধ্য দিয়ে শরীর দেখা যায় অথবা এমন চোস্ত ও আঁটসাঁট হয় যার ফলে তার সাহায্যে দৈহিক কাঠামো ও দেহের উঁচু-নীচু অংগ সবই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী------আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে, জীবনের সকল কাজেকর্মে সমস্ত ব্যাপারেই সবসময় যেন মানুষের মুখে আল্লাহর নাম এসে যায়। মানুষের মনে আল্লাহর চিন্তা পুরোপুরি ও সর্বব্যাপী আসন গেঁড়ে না বসা পর্যন্ত এ ধরনের অবস্থা তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না। মানুষের চেতনার জগত অতিক্রম করে যখন অচেতন মনের গভীরদেশেও এ চিন্তা বিস্তৃত হয়ে যায় তখনই তার অবস্থা এমন হয় যে, সে কোন কথা বললে বা কোন কাজ করলে তার মধ্যে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যাবে। আহার করলে ‘‘বিসমিল্লাহ’’ বলে শুরু করবে। আহার শেষ করবে ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে। আল্লাহকে স্মরণ করে ঘুমাবে এবং ঘুম ভাঙবে আল্লাহর নাম নিতে নিতে। কথাবার্তায় তার মুখে বারবার বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ এবং এ ধরনের অন্য শব্দ ও বাক্য বারবার উচ্চারিত হতে থাকবে। প্রত্যেক ব্যাপারে বারবার সে আল্লাহর সাহায্য চাইবে। প্রত্যেকটি নিয়ামত লাভ করার পর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। প্রত্যেকটি বিপদ আসার পর তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হবে। প্রত্যেক

সংকটে তাঁর দিকে মুখ ফিরাবে। কোন খারাপ কাজের সুযোগ এলে তাঁকে ভয় করবে। কোন ভুল বা অপরাধ করলে তাঁর কাছে মাফ চাইবে। প্রত্যেকটি প্রয়োজন ও অভাবের মুহূর্তে তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে। মোটকথা উঠতে বসতে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মে আল্লাহর স্মরণ হয়ে থাকবে তার কণ্ঠলগ্ন। এ জিনিসটি আসলে ইসলামী জীবনের প্রাণ। অন্য যে কোন ইবাদাতের জন্য কোন না কোন সময় নির্ধাতির থাকে এবং তখনই তা পালন করা হয়ে থাকে এবং তা পালন করার পর মানুষ তা থেকে আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এ ইবাদাতটি সর্বক্ষণ জারী থাকে এবং এটিই আল্লাহ ও তাঁর বন্দেগীর সাথে মানুষের জীবনের স্থায়ী সম্পর্ক জুড়ে রাখে। মানুষের মন কেবলমাত্র এসব বিশেষ কাজের সময়েই নয় বরং সর্বক্ষণ আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং তার কণ্ঠ সর্বক্ষণ তাঁর স্মরণে সিক্ত থাকলেই এরই মাধ্যমেই ইবাদাত ও অন্যান্য দ্বীনী কাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। মানুষের মধ্যে যদি এ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহলে তার জীবনে ইবাদাতও দ্বীনী কাজ ঠিক তেমনিভাবে বুদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে যেমন একটি চারাগাছকে তার প্রকৃতির অনুকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হলে তা বেড়ে উঠে। পক্ষান্তরে যে জীবন আল্লাহর এ সার্বক্ষণিক স্মরণ শূন্য থাকে সেখানে নিছক বিশেষ সময়ে অথবা বিশেষ সুযোগে অনুষ্ঠিত ইবাদাত ও দ্বীনী কাজের দৃষ্টান্ত এমন একটি চারাগাছের মতো যাকে তার প্রকৃতির প্রতিকূল আবহাওয়ায় রোপণ করা হয় এবং নিছক বাগানের মালির বিশেষ তত্ত্বাবধানের কারণে বেঁচে থাকে। একথাটিই নবী ﷺ একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "মু' আয ইবনে আনাস জুহানী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! জিহাদকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিদান লাভ করবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে স্মরণ করবে। তিনি নিবেদন করেন, রোযা পালনকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রতিদান পাবে কে? জবাব দিলেন, যে তাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করবে। আবার তিনি একই ভাবে নামায, যাকাত, হজ্জ ও সাদকা আদায়কারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। জবাবে নবী করীম ﷺ বলেন, "যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী স্মরণ করে।" (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহর দরবারে কোন্ গুণাবলীকে আসল মূল্য ও মর্যাদা দেয়া হয় এ আয়াতে তা বলে দেয়া হয়েছে। এগুলো ইসলামের মৌলিক মূল্যবোধ। একটি বাক্যে এগুলোকে একত্র সংযোজিত করে দেয়া হয়েছে। এ মূল্যবোধগুলোর প্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারীর মধ্যে কোন ফারাক নেই। কাজের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে উভয় দলের কর্মক্ষেত্র আলাদা। পুরুষদের জীবনের কিছু বিভাগে কাজ করতে হয়। নারীদের কাজ করতে হয় ভিন্ন কিছু বিভাগে। কিন্তু এ গুণাবলী যদি উভয়ের মধ্যে সমান থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে উভয়ের মর্যাদা সমান এবং উভয়ের প্রতিদানও সমান হবে। একজন রান্নঘর ও গৃহস্থালী সামলালো এবং অন্যজন খেলাফতের মসনদে বসে শরীয়তের বিধান জারী করলো আবার একজন গৃহে সন্তান লালন-পালন করলো এবং অন্যজন যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করলে--এ জন্যে উভয়ের মর্যাদা ও প্রতিদানে কোন পার্থক্য দেখা দেবে না।

৩৩ : ৩৬ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ
وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

৩৬. আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফয়সালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে তাদের কোন (ভিন্ন সিদ্ধান্তের) ইখতিয়ার সংগত নয়। আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হলো।

আলোচ্য আয়াতে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে এক ঘটনা হচ্ছে, যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিয়ে সংক্রান্ত ঘটনা। ঘটনার সংক্ষিপ্ত রূপ এই যে, যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন স্বাধীন লোক ছিলেন। কিন্তু জাহেলী যুগে কিছু লোক তাকে অল্প বয়সে ধরে এনে ওকায বাজারে বিক্রি করে দেয়, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা সে লোক থেকে তাকে খরদ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দান করেন। আর আরব দেশের প্রথানুযায়ী তাকে পোষ্য-পুত্রের গৌরবে ভূষিত করে লালন-পালন করেন। মক্কাতে তাকে 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামপুত্র যায়েদ' নামে সম্বোধন করা হত। কুরআনে কারীম এটাকে অজ্ঞতার যুগের ভ্রান্ত রীতি আখ্যায়িত করে তা নিষিদ্ধ করে দেয় এবং পোষ্যপুত্রকে তার প্রকৃত পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে নির্দেশ দেয়। যায়েদ ইবন হারেসা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যৌবনে পদার্পনের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ফুফাত বোন যয়নব বিনতে জাহশকে তার নিকট বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠান।

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু যেহেতু মুক্তিপ্রাপ্ত দাস ছিলেন সুতরাং যয়নব ও তাঁর ভ্রাতা আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ এ সম্বন্ধ স্থাপনে এই বলে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন যে, আমরা বংশ মর্যাদায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত। মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়। যাতে এ দিকনির্দেশনা রয়েছে যে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো প্রতি বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজের নির্দেশ দান করেন, তবে সে কাজ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। শরীয়তানুযায়ী তা না করার অধিকার থাকে না। শরীয়তে একাজ যে লোক পালন করবে না, আয়াতের শেষে একে স্পষ্ট গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যয়নব ও তার ভাই এ আয়াত শুনে তাদের অসম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়ে বিয়েতে রাযী হয়ে যায়। অত:পর বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। [বাগাভী]

এ আয়াত সম্পর্কে দ্বিতীয় যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয় তা হলো, জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য কোন এক আনসার সাহাবীর মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্বদ্ধ স্থাপন করতে ইচ্ছক ছিলেন। এই আনসার ও তার পরিবার-পরিজন এ সম্বন্ধ স্থাপনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই রাযী হয়ে যান এবং যথারীতি বিয়েও সম্পন্ন হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য পর্যাপ্ত জীবিকা কামনা করে দো'আ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলেন যে, তার গৃহে এত বরকত ও ধন-সম্পদের এত আধিক্য ছিল যে, মদীনার গৃহসমূহের মধ্যে এ বাড়ীটিই ছিল সর্বাধিক উন্নত ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং এর খরচের অঙ্কই ছিল সবচাইতে বেশী। পরবর্তীকালে জুলাইবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু এক জিহাদে শাহাদত বরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাফনকাফন নিজ হাতে সম্পন্ন করেন। [দেখুন: ইবন কাসীর]

এ আয়াত যদিও একটি বিশেষ সময়ে নাযিল হয় কিন্তু এর মধ্যে যে হুকুম বর্ণনা করা হয় তা ইসলামী আইনের একটি বড় মূলনীতি এবং সমগ্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থার ওপর এটি প্রযুক্ত হয়। এর দৃষ্টিতে যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে কোন হুকুম প্রমাণিত হয় সে বিষয়ে কোন মুসলিম ব্যক্তি, জাতি, প্রতিষ্ঠান,

আদালত, পার্লামেন্ট বা রাষ্ট্রের নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যবহার করার কোন অধিকার নেই। মুসলমান হবার অর্থই হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে নিজের স্বাধীন ইখতিয়ার বিসর্জন দেয়া। কোন ব্যক্তি বা জাতি মুসলমানও হবে আবার নিজের জন্য এ ইখতিয়ারটিও সংরক্ষিত রাখবে। এ দু' টি বিষয় পরস্পর বিরোধী-এ দু' টি কাজ এক সাথে হতে পারে না। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ দু' টি দৃষ্টিভংগীকে একত্র করার ধারণা করতে পারে না। যে ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকতে চায় তাকে অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে আনুগত্যের শির নত করতে হবে। আর যে মুসলমান নয়। যদি সে না মানে তাহলে নিজেকে মুসলমান বলে যত জোরে গলা ফটিয়ে চিৎকার করুক না কেন আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের দৃষ্টিতে সে মুনাফিকই গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক কুরআনের আয়াতসূরা আন-নিসা (৪:৬৫):

"অতএব তোমার পালনকর্তার কসম, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদের বিষয়ে তোমাকে বিচারক মেনে নেয়, অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনো দ্বিধাবোধ না থাকে এবং তারা তা পূর্ণরূপে মেনে নেয়।"

সূরা আন-নূর (২৪:৫১):

"মুমিনদের বক্তব্য তো কেবল এটাই—যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয়, তখন তারা বলে: 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।' আর ওরাই হলো সফলকাম।"

সূরা আল-ইমরান (৩:৩২):"বলুন,

'তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো।' তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখুন, আল্লাহ কাফেরদের ভালোবাসেন না।"

সূরা আন-নিসা (৪:৫৯):"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা উলুল আমর (কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তি) তাদেরও। অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা বিবাদে লিপ্ত হও, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও—যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো। এটাই কল্যাণকর এবং পরিণামে সর্বোত্তম।"

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কেবল সে ব্যক্তি ছাড়া যে অস্বীকার করেছে।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করেছে?" তিনি বললেন, "যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল, আর যে আমার অবাধ্য হলো সে-ই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করল।" সহীহ বুখারী (৭২৮৮):

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আমি তোমাদেরকে যে বিষয় থেকে নিষেধ করি তা থেকে বিরত থাকো, আর যে বিষয়ে নির্দেশ দিই তা যথাসাধ্য পালন করো। তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হয়েছে কেবল তাদের অতিরিক্ত প্রশ্ন করার প্রবণতা এবং নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণে।" সহীহ বুখারী (৭২৯৪) ও সহীহ মুসলিম (১৩৩৭):

ইরবায বিন সারিয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: “আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করার এবং (নেতার কথা) শোনার ও মানার অসিয়ত করছি...। তোমাদের মধ্যে আমার পর যে বেঁচে থাকবে, সে অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো...।” সুনানে আবু দাউদ (৪৬০৭) / জামে আত-তিরমিযী (২৬৭৬):

৩৩ : ৩৭ وَ اِذۡ تَقُوۡلُ لِلَّذِیۡۤ اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَ اَنۡعَمۡتَ عَلَیۡهِ اَمۡسِکۡ عَلَیۡکَ زَوۡجَکَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ
وَ تُخۡفِیۡ فِیۡ نَفۡسِکَ مَا اللّٰهُ مُبۡدِیۡهِ وَ تَخۡشَی النَّاسَ ۚ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنۡ تَخۡشٰهُ ؕ فَلَمَّا قَضٰی
زَیۡدٌ مِّنۡهَا وَطَرًا زَوَّجۡنٰکَهَا لِکَیۡ لَا یَکُوۡنَ عَلَی الۡمُؤۡمِنِیۡنَ حَرَجٌ فِیۡۤ اَزۡوَاجِ اَدۡعِیَآئِهِمۡ اِذَا قَضَوۡا
مِنۡهُنَّ وَطَرًا ؕ وَ کَانَ اَمۡرُ اللّٰهِ مَفۡعُوۡلًا

৩৭. আর স্মরণ করুন, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনি তাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে বজায় রাখ এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর আর আপনি আপনার অন্তরে গোপন করছিলেন এমন কিছু যা আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিচ্ছেন; এবং আপনি লোকদেরকে ভয় করছিলেন, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা আপনার পক্ষে অধিকতর সংগত। তারপর যখন যায়েদ তার (স্ত্রীর) সাথে প্রয়োজন শেষ করল, তখন আমরা তাকে আপনার নিকট বিয়ে দিলাম, যাতে মুমিনদের পোষ্য পুত্রদের স্ত্রীদেরকে (স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে) কোন সমস্যা না হয় যখন তারা (পোষ্য পুত্ররা) নিজ স্ত্রীর সাথে প্রয়োজন শেষ করবে (এবং তালাক দিবে)। আর আল্লাহ্র আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।

এখান থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্তকার বিষয়বস্তু এমন সময় নাযিল হয় যখন নবী ﷺ হযরত যয়নবকে (রা.) বিয়ে করে ফেলেছিলেন এবং একে ভিত্তি করে মুনাফিক, ইহুদী ও মুশরিকরা রসূলের বিরুদ্ধে তুমূল অপপ্রচার শুরু করে দিয়েছিল। এ আয়াতগুলো অধ্যয়ন করার সময় একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। যে শত্রুরা নবী (সঃ) বিরুদ্ধে ইচ্ছা করেই দুর্নাম রটাবার এবং নিজেদের অন্তর্জ্বালা মিটাবার জন্য মিথ্যা, অপবাদ, গালমন্দ ও নিন্দাবাদের অভিযান চালাচ্ছিল তাদেরকে বুঝাবার উদ্দেশ্যে এগুলো বলা হয়নি। বরং এর আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের এ অভিযানের প্রভাব থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষ করা এবং ছাড়ানো সন্দেহ-সংশয় থেকে তাদেরকে সংরক্ষিত রাখা। একথা স্পষ্ট, আল্লাহর কালাম অস্বীকারকারীদেরকে নিশ্চিন্ত করতে পারতো না। এ কালাম যদি কাউকে নিশ্চিন্ত করতে পারতো, তাহলে তারা হচ্ছে এমন সব লোক যারা একে আল্লাহর কালাম বলে জানতো এবং সে হিসেবে একে মেনে চলতো। শত্রুদের এসব আপত্তি কোনভাবে তাদের মনেও সন্দেহ-সংশয় এবং তাদের মস্তিষ্কেও জটিলতা ও সংকট সৃষ্টিতে সক্ষম না হয়ে পড়ে, সম্ভাব্য সকল সন্দেহ নিরসন করেছেন অন্যদিকে মুসলমানদেরকেও এবং স্বয়ং নবীকেও ﷺ এ ধরনের অবস্থায় তাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত তা জানিয়ে দিয়েছেন।

এখানে যায়েদের (রা.) কথা বলা হয়েছে। সামনের দিকে কথাটি সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কি ছিল এবং নবী ﷺ এর অনুগ্রহ কি ছিল? এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য এখানে সংক্ষেপে তাঁর কাহিনীটি বর্ণনা করে দেয়া জরুরী মনে করছি। তিনি ছিলেন আসলে কালব গোত্রের হারেসা ইবনে শারাহীল নামক এক ব্যক্তির পুত্র। তাঁর মাতা সু' দা বিনতে সা' লাব ছিলেন তাঈ গোত্রের বনী মা' ন শাখার মেয়ে। তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন তাঁর মা তাঁকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান। সেখানে নবী কাইন ইবনে জাসরের লোকেরা তাদের লোকালয় আক্রমণ করে এবং লুটপাট করে যেসব লোককে নিজেদের সাথে পাকড়াও করে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে হযরত যায়েদও ছিলেন। তারা তায়েফের নিকটবর্তী উকাযের মেলায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে বিক্রি করে দেয়। হযরত খাদীজার (রা.) ভাতিজা হাকিম ইবনে হিযাম তাঁকে কিনে নিয়ে যান। তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে এসে নিজের ফুফুর খেদমতে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করেন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত খাদীজার (রা.) যখন বিয়ে হয় তখন নবী করীম ﷺ তাঁর কাছে যায়েদকে দেখেন এবং তাঁর চালচলন ও আদব কায়দা তাঁর এত বেশী পছন্দ হয়ে যায় যে, তিনি হযরত খাদীজার (রা.) কাছ থেকে তাঁকে চেয়ে নেন। এভাবে এই সৌভাগ্যবান ছেলেটি সৃষ্টির সেরা এমন এক ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে এসে যান যাঁকে কয়েক বছর পরেই মহান আল্লাহ নবীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত যায়েদের (রা.) বয়স ছিল ১৫ বছর। কিছুকাল পরে তাঁর বাপ চাচা জানতে পারেন তাদের ছেলে মক্কায় আছে। তারা তাঁর খোঁজ করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে যার। তারা বলেন, আপনি মুক্তিপণ হিসেবে যা নিতে চান বলুন আমরা তা আপনাকে দিতে প্রস্তুত আছি, আপনি আমাদের সন্তান আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন। নবী করীম ﷺ বলেন, আমি ছেলেকে ডেকে আনছি এবং তাঁর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, সে চাইলে আপনাদের সাথে চলে যেতে পারে এবং চাইলে আমার কাছে থাকতে পারে। যদি সে আপনাদের সাথে চলে যেতে চায় তাহলে আমি এর বিনিময়ে মুক্তি পণ হিসেবে কোন অর্থ নেবো না এবং তাঁকে এমনিই ছেড়ে দেবো। আর যদি সে আমার কাছে থাকতে চায় তাহলে আমি এমন লোক নই যে, কেউ আমার কাছে থাকতে চাইলে আমি তাকে খামখা তাড়িয়ে দেবো। জবাবে তারা বলেন, আপনি যে কথা বলেছেন তাতো ইনসাফেরও অতিরিক্ত। আপনি ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করে নিন। নবী করীম ﷺ যায়েদকে ডেকে আনেন এবং তাঁকে বলেন, এই দু' জন ভদ্রলোককে চেনো? যায়েদ জবাব দেন, জি হ্যাঁ, ইনি আমার পিতা এবং ইনি আমার চাচা। তিনি বলেন, আচ্ছা, তুমি এদেরকেও জানো এবং আমাকেও জানো। এখন তোমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তুমি চাইলে এদের সাথে চলে যেতে পারো এবং চাইলে আমার সাথে থেকে যাও। তিনি জবাব দেন, আমি আপনাকে ছেড়ে কারো কাছে যেতে চাই না। তার বাপ ও চাচা বলেন, যায়েদ, তুমি কি স্বাধীনতার ওপর দাসত্বকে প্রাধান্য দিচ্ছো এবং নিজের মা-বাপ ও পরিবার পরিজনকে ছেড়ে অন্যদের কাছে থাকতে চাও? তিনি জবাব দেন, আমি এ ব্যক্তির যে গুণাবলী দেখেছি তার অভিজ্ঞতা লাভ করার পর এখন আর দুনিয়ার কাউকেও তাঁর ওপর প্রাধান্য দিতে পারি না। যায়েদের এ জবাব শুনে তার বাপ ও চাচা সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁকে রেখে যেতে রাজি হয়ে যান। নবী ﷺ তখনই যায়েদকে আযাদ করে দেন এবং হারাম শরীফে গিয়ে কুরাইশদের সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা করেন, আপনারা সবাই সাক্ষী থাকেন আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তাঁর উত্তরাধিকারী হবো। এ কারণে লোকেরা তাঁকে যায়েদ ইবণে মুহাম্মাদ বলতে থাকে। এসব নবুওয়াতের পূর্বের ঘটনা। তারপর যখন নবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন তখন চারজন এমন ছিলেন যারা এক মুহূর্তের জন্যও কোন প্রকার সন্দেহ ছাড়াই তাঁর মুখে নবুওয়াতের দাবী শুনতেই তাকে নবী বলে মেনে নেন। তাদের একজন হযরত খাদীজা (রা.),

দ্বিতীয়জন হযরত যায়েদ (রা.), তৃতীয় জন হযরত আলী (রা.) এবং চতুর্থজন হযরত আবু বকর (রা.)। এ সময় হযরত যায়েদের (রা.) বয়স ছিল ৩০ বছর এবং নবী করীমের ﷺ সাথে তাঁর ১৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। হিজরাতের পরে ৪ হিজরীতে নবী (সা.) নিজের ফুফাত বোনের সাথে তাঁর বিয়ে দিয়ে দেন। নিজের পক্ষ থেকে তার মোহরানা আদায় করেন এবং ঘর-সংসার গুছিয়ে নেবার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও দেন।

এ অবস্থার প্রতিই মহান আল্লাহ তাঁর "যার প্রতি আল্লাহ ও তুমি অনুগ্রহ করেছিল" বাক্যাংশের মধ্যে ইশারা করেছেন।তাকে বলছিলেন যে, তুমি নিজের স্ত্রীকে তোমার বিবাহাধীনে থাকতে দাও।" এ ব্যক্তি হলো যায়েদ।

হযরত যায়েদ (রা.) ও হযরত যয়নবের (রা.) সম্পর্ক তিক্ততার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল এবং তিনি বারবার অভিযোগ করার পর শেষ পর্যন্ত নবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করেন, আমি তাকে তালাক দিতে চাই। হযরত যয়নব (রা.) যদিও আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম মেনে নিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে যান কিন্তু নিজের মন থেকে এ অনুভূতিটি তিনি কখনো মুছে ফেলতে পারেননি যে, যায়েদ একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, তাদের নিজোদের পরিবারের অনুগ্রহে লালিত এবং তিনি নিজে আরবের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও এ ধরনের একজন নিম্নমানের লোকের সাথে তার বিয়ে দেয়া হয়েছে। এ অনুভূতির কারণে দাম্পত্য জীবনে তিনি কখনো হযরত যায়েদকে নিজের সমকক্ষ ভাবেননি। এ কারণে উভয়ের মধ্যে তিক্ততা বেড়ে যেতে থাকে। এক বছরের কিছু বেশী দিন অতিবাহিত হতে না হতেই অবস্থা তালাক দেয়া পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যায়নাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহার সম্পর্কে ভাষাগত শ্রেষ্ঠত্ব, গোত্রগত কৌলিন্যভিমান এবং আনুগত্য ও শৈথিল্য প্রদর্শনের অভিযোগ উত্থাপন করতেন। একদিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে এসব অভিযোগ পেশ করতে গিয়ে যায়নবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেনঃ "নিজ স্ত্রীকে তোমার বিবাহধীনে থাকতে দাও এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর।" [দেখুন: বাগভী; ফাতহুল কাদীর; তাবারী]

কেউ কেউ এ বাক্যটির উল্টা অর্থ গ্রহণ করেছেন এভাবে, নবী ﷺ নিজেই হযরত যয়নবকে (রা.) বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁর মন চচ্ছিল হযরত যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দিক। কিন্তু যখন যায়েদ (রা.) এসে বললেন, আমি স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই তখন তিনি নাউযুবিল্লাহ আসল কথা মনের মধ্যে চেপে রেখে কেবলমাত্র মুখেই তাঁকে নিষেধ করলেন। একথায় আল্লাহ বলছেন, "তুমি মনের মধ্যে যে কথা লুকিয়ে রাখছিলে আল্লাহ তা প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন।" অথচ আসল ব্যাপারটা এর সম্পূর্ণ উল্টো। যদি এ সূরার ১, ২, ৩ ও ৭ আয়াতের সাথে এ বাক্যটি মিলিয়ে পড়া হয়, তাহলে পরিষ্কার অনুভূত হবে যে, হযরত যায়েদ ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে যে সময় তিক্ততা বেড়ে যাচ্ছিল সে সময়ই আল্লাহ নবী ﷺ কে এ মর্মে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, যায়েদ যখন তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেবে তখন তোমাকে তার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু যেহেতু আরবের সে সমাজে পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার অর্থ কি তা নবী ﷺ জানতেন এবং তাও এমন এক অবস্থায় যখন মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক মুসলমান ছাড়া বাকি সমগ্র আরব দেশ তাঁর বিরুদ্ধে ধনুকভাঙাপণ করে বসেছিল-এ অবস্থায় তিনি এ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে ইতস্তত করছিলেন। এ কারণে হযরত যায়েদ (রা.) যখন স্ত্রীকে তালাক দেবার সংকল্প প্রকাশ করেন তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে বলেন আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ো না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, যায়েদ যদি তালাক না দেন,

তাহলে তিনি এ বিপদের মুখোমুখী হওয়া থেকে বেঁচে যাবেন। নয়তো যায়েদ তালাক দিলেই তাঁকে হুকুম পালন করতে হবে এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় ও অপপ্রচারের ভয়াবহ তুফান সৃষ্টি করা হবে।

কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে উচ্চ মনোবল, দৃঢ় সংকল্প ও আল্লাহর ফায়সালায় রাজি থাকার যে উচ্চ মর্যাদার আসনে দেখতে চাচ্ছিলেন সে দৃষ্টিতে নবী করীমের ﷺ ইচ্ছা করে যায়েদকে তালাক থেকে বিরত রাখা নিম্নমানের কাজ বিবেচিত হয়। তিনি আসলে ভাবছিলেন যে, এর ফলে তিনি এমন কাজ করা থেকে বেঁচে যাবেন যাতে তাঁর দুর্নামের আশঙ্কা ছিল। অথচ আল্লাহ একটি বড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁকে দিয়ে সে কাজটি করাতে চাচ্ছিলেন। "তুমি লোকভয় করছ অথচ আল্লাহকে ভয় করাই অধিকতর সঙ্গত" -এ কথাগুলো পরিষ্কারভাবে এ বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করছে।

ইমাম যয়নুল আবেদীন হযরত আলী ইবনে হোসাইন (রা.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাই বলেছেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ নবী ﷺ কে এই মর্মে খবর দিয়েছিলেন যে, যয়নব (রা.) আপনার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হতে যাচ্ছেন। কিন্তু যায়েদ (রা.) যখন এসে তাঁর কাছে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং নিজের স্ত্রী ত্যাগ করো না। এ কথায় আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছিলাম, আমি তোমাকে যয়নবের সাথে বিয়ে দিচ্ছি অথচ তুমি যায়েদের সাথে কথা বলার সময় আল্লাহ যেকথা প্রকাশ করতে চান তা গোপন করছিলে। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে)

আল্লামা আলূসীও তাফসীর রুহুল মা' আনীতে এর একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "এটি হচ্ছে শ্রেয়তর কাজ পরিত্যাগ করার জন্য ক্রোধ প্রকাশ। নবী ﷺ নিশ্চুপ থাকতেন অথবা যায়েদকে (রা.) বলতেন, তুমি যা চাও করতে পারো, এ অবস্থায় এটিই ছিল শ্রেয়তর। অভিব্যক্ত ক্রোধের সার হচ্ছেঃ তুমি কেন যায়েদকে বললে তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না? অথচ আমি তোমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি যে, যয়নব তোমার স্ত্রীদের মধ্যে শামিল হবে।"

যায়েদ (রা.) যখন নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিলেন এবং তাঁর ইদ্দত পুরা হয়ে গেলো। "প্রয়োজন পূর্ণ করলো" শব্দ গুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, তাঁর কাছে যায়েদের আর কোন প্রয়োজন থাকলো না। কেবলমাত্র তালাক দিলেই এ অবস্থাটির সৃষ্টি হয় না। কারণ স্বামীর আর কোন আকর্ষণ থেকে গেলে ইদ্দতের মাঝখানে তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে। আর তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভবতী হওয়া বা না হওয়ার কথা জানতে পারার মধ্যেও স্বামীর প্রয়োজন থেকে যায়। তাই যখন ইদ্দত খতম হয়ে যায় একমাত্র তখনই তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর মধ্যে স্বামীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়।

নবী ﷺ নিজেই নিজের ইচ্ছায় এ বিয়ে করেননি বরং আল্লাহর হুকুমের ভিত্তিতে করেন, এ ব্যাপারে এ শব্দগুলো একবারেই সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

এ বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাকের আদেশে সাধারণ বিয়ে-শাদীর প্রচলিত নিয়ম ও শর্তাবলী থেকে ব্যতিক্রম ভাবে সুসম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ঈজাব-কবুল, অলী (অভিভাবক), মোহর এবং কোন সাক্ষী ছাড়াই।

এটি হল যয়নাবের সাথে নবী (সাঃ)-এর বিয়ের কারণ। আর তা এই যে, আগামীতে কোন মুসলিম যেন এই ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং প্রয়োজনে পোষ্যপুত্রের ত্বালাক দেওয়া স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারে।

অর্থাৎ, পূর্ব থেকে তকদীরে লেখা ছিল। যা যে কোন অবস্থাতেই হওয়ার ছিল।

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللهُ لَهٗ ؕ سُنَّةَ اللهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ ৩৩ : ৩৮
قَبْلُ ؕ وَ كَانَ اَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرَنِۙ

৩৮. নবীর জন্য সেটা (করতে) কোন সমস্যা নেই যা আল্লাহ বিধিসম্মত করেছেন তার জন্য। আগে যারা চলে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও এটাই ছিল আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহর ফয়সালা সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।

এ শব্দগুলো থেকে একথা পরিষ্কারভবে প্রকাশিত হয় যে, অন্য মুসলমানদের জন্য তো এ ধরনের বিয়ে নিছক মুবাহ তথা অনুমোদিত কাজ কিন্তু নবীর ﷺ জন্য এটি ছিল একটি ফরয এবং এ ফরয আল্লাহ তাঁর প্রতি আরোপ করেছিলেন।

নবীদের জন্য চিরকাল এ বিধান নির্ধারিত রয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে হুকুমই আসে তা কার্যকর করা তাঁদের জন্য স্থিরীকৃত কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে বিরত থাকার কোন অবকাশ তাঁদের জন্য নেই। যখন আল্লাহ নিজের নবীর ওপর কোন কাজ ফরয করে দেন তখন সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগলেও তাঁকে সে কাজ করতেই হয়।

এই আয়াতটি যে ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিল (যয়নব বিনতে জাহশ রা.-এর সাথে রাসূলুল্লাহ সা.-এর বিবাহ), তা বুখারী শরীফের একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর ৪৭৪১ ও ৭৪২০:আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন যয়নব বিনতে জাহশ (রা.)-এর ইদ্দত শেষ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) যায়েদ (রা.)-কে বললেন, "তুমি গিয়ে আমার পক্ষ থেকে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দাও।" ... এরপর আল্লাহ তাআলা নিজেই এই বিয়ের ফয়সালা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করেন (সূরা আহযাবের ৩৭ ও ৩৮ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে) Hadithbd Quran Tafsir। যয়নব (রা.) অন্য নবীদের স্ত্রীদের সামনে গর্ব করে বলতেন:

"তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবকেরা, আর আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর থেকে সম্পাদন করেছেন।

আয়েশা (রা.) এই প্রসংগে বলতেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি ওহীর কোনো অংশ গোপন করতে পারতেন, তবে তিনি এই আয়াতটিই (সূরা আহযাবের আয়াত) গোপন করতেন।" কারণ এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা লোকলজ্জার উর্ধ্বে উঠে তাঁর ফয়সালা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছিলেন।"সহীহ বুখারী ৪৭৪২:

৩৩ : ৩৯ الَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللهِ وَ يَخْشَوْنَهٗ وَ لَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللهَ ؕ وَ كَفٰى بِاللهِ حَسِيْبًا

৩৯. তারা আল্লাহর বাণী প্রচার করত, আর তাঁকে ভয় করত এবং আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকেও ভয় করত না। আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে আল্লাহই যথেষ্ট।

নবী আলাইহিমুস সালামগণের যে অপর এক গুণ বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে তা এই যে, এসব মহাত্মবৃন্দ আল্লাহকে ভয় করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ভয় করেন না। [মুয়াস্‌সার, ফাতহুল কাদীর]

যার ফলে কারোর ভয় বা প্রতাপ তাঁদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌছাতে না বাধা দিতো, আর না কারো মন্তব্য, নিন্দাবাদ, সমালোচনা ইত্যাদির তাঁরা পরোয়া করতেন।

মূল শব্দগুলো হচ্ছে, وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًاএর দু’ টি অর্থ।

এক, প্রত্যেকটি ভয় ও বিপদের মোকাবিলায় আল্লাহই যথেষ্ট।

দুই, হিসেব নেবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তাঁর ছাড়া আর কারো কাছে জবাবদিহির ভয় করার কোন প্রয়োজন নেই।

অর্থাৎ, তিনি সর্বত্র তাঁর ইলম ও ক্ষমতা নিয়ে বিদ্যমান, যার ফলে তিনি তাঁর বান্দাদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট এবং আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত-তবলীগে তাঁদের যে সমস্যা আসে তাতে তিনি সাহায্য করেন এবং শত্রুদের নাপাক বাসনা ও সম্মিলিত অসৎ প্রচেষ্টা থেকে তাঁদেরকে রক্ষা করেন।

৩৩ : ৪০ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَاۤ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمًا

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আর আল্লাহ সর্বকিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।

বিরোধীরা নবী ﷺ এর এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উঠাচ্ছিল এ একটি বাক্যের মাধ্যমে সেসবের মূলোচ্ছেদ করে দেয়া হয়েছে।

তাদের প্রথম অভিযোগ ছিল, তিনি নিজের পুত্রবধূকে বিয়ে করেন, অথচ তাঁর নিজের শরীয়াতেও পুত্রের স্ত্রী পিতার জন্য হারাম। এর জবাবে বলা হয়েছে, “মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নন।” অর্থাৎ যে ব্যক্তির তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হয়েছে তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের পুত্রই ছিলেন না, কাজেই তার তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হবে কেন? তোমরা নিজেরাই জানো মুহাম্মাদ ﷺ এর আদতে কোন পুত্র সন্তানই নেই।

তাদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল, ঠিক আছে, পালক পুত্র যদি আসল পুত্র না হয়ে থাকে তাহলেও তার তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করা বড় জোর বৈধই হতে পারতো কিন্তু তাকে বিয়ে করার এমন কি প্রয়োজন ছিল? এর জবাবে

বলা হয়েছে, “কিন্তু তিনি আল্লাহর রসূল।” অর্থাৎ রসূল হবার কারনে তাঁর ওপর এ দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছিল যে তোমাদের রসম-রেওআজ যে হালাল জিনিসটিকে অযথা হারাম গণ্য করে রেখেছে সে ব্যাপারে সকল রকমের স্বার্থপ্রীতির তিনি অবসান ঘটিয়ে দেবেন এবং তার হালাল হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশই রাখবে না।

আবার অতিরিক্ত তাকিদ সহকারে বলা হয়েছে, “এবং তিনি শেষ নবী।” অর্থাৎ যদি কোন আইন ও সামাজিক সংস্কার তাঁর আমলে প্রবর্তিত না হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পরে আগমনকারী নবী তার প্রবর্তন করতে পারতেন, কিন্তু তাঁর পরে আর কোন রসূল তো দূরের কথা কোন নবীই আসবেন না। কাজেই তিনি নিজেই জাহেলিয়াতের এ রসমটির মুলোচ্ছেদ করে যাবেন, এটা আরো অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

এরপর আরো বেশী জোর দিয়ে বলা হয়েছে, “আল্লাহ প্রত্যেটি বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।” অর্থাৎ আল্লাহ জানেন, এ সময় মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমে জাহেলিয়াতের এ রসমটির মুলোচ্ছেদ করা কেন জরুরী ছিল এবং এমনটি না করলে কি মহা অনর্থ হতো। তিনি জানেন, এখন আর তাঁর পক্ষ থেকে কোন নবী আসবেন না, কাজেই নিজের শেষ নবীর মাধ্যমে এখন যদি তিনি এ রসমটিকে উৎখাত না করেন তাহলে এমন দ্বিতীয় আর কোন সত্তাই নেই যিনি এটি ভঙ্গ করলে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্য থেকে চিরকালেন জন্য এটি মূলোৎপাটিত হয়ে যাবে। পরবর্তী সংস্কারকগণ যদি এটি ভাঙেন, তাহলে তাদের মধ্য থেকে আরো কর্মও তাঁর ইন্তিকালের পরে এমন কোন বিশ্বজনীন ও চিরন্তন কর্তৃত্বের অধিকারী হবে না যার ফলে প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক যুগের লোকেরা তার অনুসরণ করতে থাকবে এবং তাদের মধ্য থেকে কারো ব্যক্তিত্ব ও তাঁর নিজের মধ্যে এমন কোন পবিত্রতার বাহন হবে না যার ফলে তাঁর কোনো কাজ নিছক তাঁর সুন্নাত হবার কারণে মানুষের মন থেকে অপছন্দনীয়তার সকল প্রকার ধারণার মূলোচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে। দুঃখের বিষয়, বর্তমান যুগের একটি দল এ আয়াতটি ভুল ব্যাখ্যা করে একটি বড় ফিতনার দরোজা খুলে দিয়েছে, তাই খতমে নবুওয়াত বিষটির পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং এ দলটির ছড়ানো বিভ্রান্তিগুলো নিরসনের জন্য আমি এ সূরার তাফসীরের শেষে একটি বিস্তারিত পরিশিষ্ট সংযোজন করে দিয়েছি।

----- বর্তমান যুগে একটি দল নতুন নবুওয়াতের ফিতনা সৃষ্টি করেছে। এর “খাতামুন নাবিয়্যীন” শব্দের অর্থ করে “নবীদের” মোহর। এরা বুঝাতে চায় রসূলুল্লাহর ﷺ পর তার মোহরাংকিত হয়ে আরো অনেক নবী দুনিয়ায় আগমন করবেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো নবুওয়াত রসূলুল্লাহর মোহরাংকিত না হয় ততক্ষণ তিনি নবী হতে পারবেন না।

কিন্তু “খাতামুন নাবিয়্যীন” শব্দ সম্বলিত আয়াতটি যে ঘটনা পরস্পরায় বিবৃত হয়েছে, তাকে সেই বিশেষ পরিবেশে রেখে বিচার করলে, তা থেকে এ অর্থ গ্রহণের কোন সুযোগই দেখা যায় না। অধিকন্তু এ অর্থ গ্রহণ করার পর এ পরিবেশে শব্দটির ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্যের ও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

এটা কি নিতান্ত অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় যে, যয়নবের নিকাহর বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট নানা প্রকার সংশয়-সন্দেহের জবাব দিতে দিতে হঠাৎ মাঝখানে বলে দেয়া হলোঃ মুহাম্মাদ ﷺ নবীদের মোহর। অর্থাৎ ভবিষ্যতে যত নবী আসবেন তারা সবাই তারই মোহরাংকিত হবেন। আগে পিছের এ ঘটনা

মাঝখানে একথাটির আকস্মিক আগমন শুধু অবান্তরই নয়, এ থেকে প্রতিবাদকারীদের জবাবে যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছিল, তাও দূর্বল হয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে প্রতিবাদকারীদের হাতে একটা চমৎকার সুযোগ আসতো এবং তারা সহজেই বলতে পারতো যে, আপনার জীবনে যদি এ কাজটা সম্পন্ন না করতেন, তাহলে ভালই হতো, কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকতো না, এই বদ রসমটা বিলুপ্ত করার যদি এতেই প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে আপনার পরে আপনার মোহরাংকিত হয়ে যেসব নবী আসবেন, এ কাজটা তাদের হাতেই সম্পন্ন হবে।

উল্লেখিত দলটি শব্দটির আর একটি বিকৃত অর্থ নিয়েছেঃ "খাতামুন নাবিয়্যীন" অর্থ হলঃ "আফজালুন নাবিয়্যীন।" অর্থাৎ নবুওয়াতের দরজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা নবুওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে রসূলুল্লাহর ওপর। কিন্তু এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখিত বিভ্রান্তির পুনরাবির্ভাবের হাত থেকে নিস্তার নেই। অগ্রপশ্চাতের সাথে এরও কোন সম্পর্ক নেই। বরং এটি পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থবহ। কাফের ও মুনাফিকরা বলতে পারতোঃ "জনাব, আপনার চাইতে কম মর্যাদার হলেও আপনার পরে যখন আরো নবী আসছেন, তখন এ কাজটা না হয় তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন। এ বদ রসমটাও যে আপনাকেই মিটাতে হবে, এরই বা কি এমন আবশ্যকতা আছে" !

১. বর্ণনার ধারাবাহিকতা অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ৬৭ থেকে ৭৯ টীকার আলোচনাও সামনে রাখা দরকার

আভিধানিক অর্থ

তাহলে পূর্বাপর ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এখানে "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের অর্থ নবুওয়য়াতের সিলসিলার পরিসমাপ্তি ঘোষণা অর্থাৎ রসূলুল্লাহর ﷺ পর আর কোন নবী আসবেন না। কিন্তু শুধু পূর্বাপর সম্বন্ধের দিক দিয়েই নয়, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়েও এটিই একমাত্র সত্য। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খতম' ; শব্দের অর্থ হলঃ মোহর লাগানো, বন্ধ করা, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং কোন কাজ শেষ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করা।

খাতামাল আমাল (خَتَمَ ألعَمَلَ) অর্থ হলোঃ ফারাগা মিনাল আমাল (فَرَغَ مِنَ ألعَمَلَ) অর্থাৎ কাজ শেষ করে ফেলেছে।

খাতামাল এনায়া (خَتَمَ ألاِنَاءَ) অর্থ হলোঃ পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে আসতে এবং বাইরে থেকে কিছু ভেতরে যেতে না পারে

খাতামাল কিতাব (خَتَمَ الكِتَابَ) অর্থ হলোঃ পত্রের মুখ বন্ধ করে তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, ফলে পত্রটি সংরক্ষিত হবে।

খাতামা আলাল কালব (خَتَمَ عَلَى القَلبِ) অর্থ হলোঃ দিলের ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। এরপর কোন কথা আর সে বুঝতে পারবে না এবং তার ভেতরের জমে থাকা কোন কথা বাইরে বেরুতে পারবে না।

খিতামু কুল্লি মাশরুব (خِتَامَ كُلِّ مَشرُوبٍ) অর্থ হলোঃ কোন পানীয় পান করার পর শেষে যে স্বাদ অনুভূত হয়।

খাতিমাতু কুল্লি শাইয়িন আকিবাতুহু ওয়া আখিরাতুহু অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিসের খাতিমা অর্থ হলো তার পরিণাম এবং শেষ।

খাতামাশ শাইয়্যি বালাগা আখিরাহ (خَتَمَ الشَّئِ, بَلَغَ اخِرَهُ) অর্থাৎ কোন জিনিসকে খতম করার অর্থ হলো তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। খতমে কুরআন বলতে এ অর্থ গ্রহণকরা হয় এবং এ অর্থের ভিত্তিতে প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় 'খাওয়াতিম' ।

খাতামুল কওমে আখেরুহুম (خَاتَمُ الْقَوْمِ اخرهم) অর্থাৎ খাতামুল কওম অর্থজাতির শেষ ব্যক্তি (দ্রষ্টব্যঃ লিসানুল আরব, কামুস এবং আকারাবুল মাওয়ারিদ।) ১

এ জন্যই সমস্ত অভিধান বিশারদ এবং তাফসীরকারগণ একযোগে "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের অর্থ নিয়েছেন, আখেরুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খাতাম' -এর অর্থ ডাকঘরের মোহর নয়, যা চিঠির ওপর লাগিয়ে চিঠি পোষ্ট করা হয় বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এ উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোন জিনিস বাইরে বেরুতে পারবে না এবং বাইরের কোন জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

১. এখানে আমি মাত্র তিনটি আভিধানের উল্লেখ করলাম। কিন্তু শুধু এই তিনটি অভিধানই কেন, আরবি ভাষায় যে কোন নির্ভরযোগ্য অভিধান খুলে দেখুন, সেখানে 'খতম' শব্দের উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যাই পাবেন। কিন্তু 'খতমে নবুওয়াত' অস্বীকারকারীরা আল্লাহর দ্বীনের সুরক্ষিত গৃহে সিঁদ কাটার জন্য এর আভিধানিক অর্থকে পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন। তারা বলতে চান, কোন ব্যক্তিকে খাতামুশ শোয়ারা খাতামুল ফোকাহা অথবা 'খাতামুল মুফাসসিরীণ' বললে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় নাযে, যাকে ঐ পদবী দেয়া হয়, তার পরে আর কোন শায়ের তথা কবি, ফকিহ অথবা মুফাসসির পয়দা হননি। বরং এর অর্থ এই যে, ঐ ব্যক্তির ওপরে উল্লিখিত বিদ্যা অথবা শিল্পের পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যধিক ফুটিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে এই ধরনের পদবী ব্যবহারের ফলে কখনো খতম-এর অভিধানিক অর্থ 'পূর্ণ' অথবা 'শ্রেষ্ঠ' হয় না এবং শেষ অর্থে এর ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ বলেও গণ্য হয় না। একমাত্র ব্যাকরণ-রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এ ধরনের কথা বলতে পারেন। কোন ভাষারই নিয়ম এ নয় যে, কোন একটি শব্দ তার আসল অর্থের পরিবর্তে কখনো কখনো দূর সম্পর্কের অন্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হলে সেটাই তার আসল অর্থে পরিণত হবে এবং আসল আভিধানিক অর্থে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। আপনি যখন কোন আরবের সম্মুখে বলবেনঃ جَاءَ خَاتَمَ الْقَوْمَ(জাআ খাতামুল কওম)--তখন কখনো সে মনে করবে না যে, গোত্রের শ্রেষ্ঠ অথবা কামেল ব্যক্তি এসেছে। বরং সে মনে করবে যে, গোত্রের সবাই এসে গেছে, এমনকি অবশিষ্ট শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্তও।

এই সঙ্গে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, কোন কোন লোককে যে "খাতামুশ শো' য়ারা" "খাতামুল ফুকাহা" ও "খাতামুল মুহাদ্দিসীন" উপাধিগুলো দোয়া হয়েছে সেগুলো মানুষরাই তাদেরকে দিয়েছে। আর মানুষ যে ব্যক্তিকে কোন গুণের ক্ষেত্রে শেষ বলে দিচ্ছে তার পরে ঐ গুণ সম্পন্ন আর কেউ জন্মাবে কিনা তা সে কখনোই জানতে পারে না। তাই মানুষের কথায় এ ধরনের উপাধির অর্থ নিছক বাড়িয়ে বলা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার স্বীকৃতি ছাড়া আর বেশী কিছু হতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ যখন কারো ব্যাপারে বলে দেন যে,

অমুক গুণটি অমুক ব্যক্তি পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে তখন তাকে মানুষের কথার মতো উপমা বা রূপক মনে করে নেবার কোন কারণ নেই। আল্লাহ যদি কাউকে শেষ কবি বলে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিন্তভাবে তারপর আর কোন কবি হতে পারে না। আর তিনি যাকে শেষ নবী বলে দিয়েছেন তার পরে আর কোন নবী হওয়াই অসম্ভব। কারণ, আল্লাহ হচ্ছেন 'আলিমুল গাইব' এবং মানুষ আলিমুল গাইব নয়। আল্লাহর কাউকে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' বলে দেয়া এবং মানুষের কাউকে 'খাতামুশ শোয়ারা বা খাতামুল ফুকারা', বলে দেয়া কেমন করে একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে?

খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি

পূর্বাপর সম্বন্ধ এবং আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে শব্দটির যে অর্থ হয়, রসূলুল্লাহর ﷺ বিভিন্ন ব্যাখ্যাও তা সমর্থন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কতিপয় অত্যন্ত নির্ভুল হাদীসের উল্লেখ করছিঃ

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব করতেন আল্লাহর রসূলগণ। যখন কোন নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য কোন নবী তার স্থলাভিষিক্তি হতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী হবে না, শুধু খলীফা।

جَاءَ خَاتَمَ الْقَوْمَ)2 (قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِى كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ ، إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ)بخارى كتاب المناقب ,باب خاتم النبين(

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো এই যে, এক ব্যক্তি একটি দালান তৈরি করলো এবং খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সেটি সজ্জিত করলো। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, "এ স্থানে একটা ইট রাখা হয়নি কেন? বস্তুত আমি সেই ইট এবং আমিই শেষ নবী।" (অর্থাৎ আমার আসার পর নবুওয়াতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন এর মধ্যে এমন কোন শূন্যস্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য আবার কোন নবীর প্রয়োজন হবে।)

এই বক্তব্য সম্বলিত চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে কিতাবুল ফাযায়েলের বাবু খাতামুন নাবিয়্যানে উল্লেখিত হয়েছে এবং শেষ হাদীসটিতে এতোটুকু অংশ বর্ধিত হয়েছে-فَجِئْتُ فَخَتَمْتُ الْأَنْبِيَاءَ "অতঃপর আমি এলাম এবং আমি নবীদের সিলসিলা 'খতম' করে দিলাম।"

হজরত সওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) দীর্ঘ এক হাদিসে ইরশাদ করেছেন:"...নিশ্চয়ই আমার উম্মতের মধ্যে ৩০ জন মিথ্যাবাদীর (দাজ্জাল) আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।" (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নম্বর: ৪২৫২; জামে আত-তিরমিযী, হাদিস নম্বর: ২২১১)

তাবুক যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ (সা.) হজরত আলী (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যাওয়ার সময় বলেছিলেন:"তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা ঠিক তেমনি, যেমন মূসার কাছে হারূনের মর্যাদা ছিল? তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ৪৪১৬)

হাদীসটি তিরমিযী শরীফে এই শব্দ সম্বলিত হয়ে ‘কিতাবুল মানাকিবের বাবু ফাদলিন নবী’ এবং কিতাবুল আদাবের ‘বাবুল আমসালে’ বর্ণিত হয়েছে।

মুসনাদে আবু দাউদ তিয়ালাসীতে হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের সিলসিলায় উল্লেখিত হয়েছে এবং এর শেষ অংশটুকু হলো خُتِمَ بِی الْأَنْبِيَاء “আমার মাধ্যমে নবীদের সিলসিলা ‘খতম’ করা হলো।”

মুসনাদে আহমাদে সামান্য শাব্দিক হেরফেরের সাথে এই বক্তব্য সম্বলিত হাদীস হযরত উবাই ইবনে কা’ব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত সাহাবী, তাবেয়ী এবং মুসলিম স্কলারদের ঐক্যমত (ইজমা) রয়েছে যে, হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর যে ব্যক্তিই নবুয়তের দাবি করবে, সে মিথ্যাবাদী এবং ইসলাম থেকে খারিজ। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পরপরই যখন মুসায়লামা কাযযাব ও আসওয়াদ আনাসী নবুয়তের মিথ্যা দাবি করেছিল, তখন প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর (রা.) ও সমস্ত সাহাবী তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ “ছ’টা ব্যাপারে অন্যান্য নবীদের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছেঃ

(১) আমাকে পূর্ণ অর্থব্যঞ্জক সংক্ষিপ্ত কথা বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে।

(২) আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে।

(৩) যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে।

(৪) পৃথিবীর যমীনকে আমার জন্য মসজিদে (অর্থাৎ আমার শরীয়াতে নামায কেবল বিশেষ ইবাদাতগাহে নয়, দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানে পড়া যেতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে (শুধু পানিই নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল অর্থাৎ অজু এবং গোসলের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে) পরিণত করা হয়েছে।

(৫) সমগ্র দুনিয়ার জন্য আমাকে রসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে এবং

(৬) আমার ওপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে।”

(4) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فَلاَ رَسُولَ بَعْدِى وَلاَ نَبِىَّ
(ترمذى- كتاب الرؤيا ,باب ذهاب النبوة- مسند احمد ,مرويات بن مالك رض)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ “রিসালাত এবং নবুওয়াতের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। আমার পর আর কোন রসূল এবং নবী আসবে না।”

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ “আমি মুহাম্মাদ। আমি আহমাদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফরকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী আমার পরে লোকদেরকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে। (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকি আছে) আমি সবার শেষে আগমনকারী হলো সেই) যার পরে আর নবী আসবে না।

() রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ “আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি তার উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। (কিন্তু এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মাত। দাজ্জাল নিঃসন্দেহে এখন তোমাদের মধ্যে বহির্গত হবে।”

() আবদুর রহমান ইবনে জোবায়ের বলেনঃ আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আ’ সকে বলতে শুনেছি, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের গৃহ থেকে বরে হয়ে আমাদের মধ্যে তাশরীফ আনলেন। তিনি এভাবে আসলেন যেন আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মুহাম্মাদ। অতঃপর বললেন, আমার পর আর কোন নবী নেই।

--- রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমার পরে আর কোন নবুওয়াত নেই। আছে সুবংবাদ দানকারী ঘটনাবলী। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, সুসংবাদ দানকারী ঘটনাগুলো কি? জবাবে তিনি বললেনঃ ভালো স্বপ্ন। অথবা বললেন, কল্যাণময় স্বপ্ন। (অর্থাৎ আল্লাহর অহী নাযিল হবার এখন আর সম্ভাবনা নেই। বড়জোর এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যদি কাউকে কোন ইঙ্গিত দেয়া হয়, তাহলে শুধু ভালো স্বপ্নের মাধ্যমেই তা দেয়া হবে)।

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ-)ترمذى – كتاب المناقب(

----রসূলুল্লাহ(সা.) বলেনঃ আমার পরে যদি কোন নবী হতো, তাহলে উমর ইবনে খাত্তাব সে সৌভাগ্য লাভ করতো।

() قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى-)بخارى ومسلم – كتاب فضائل الصحابه

রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলীকে (রা.) বলেনঃ আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নেই।

বুখারী এবং মুসলিম তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহমাদে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত দু’ টি হাদীস হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বর্ণনার শেষাংশ হলোঃالا انه لانبوة بعدى “কিন্তু আমার পরে আর কোন নবুওয়াত নেই।” আবু দাউদ তিয়ালাসি, ইমাম আহমাদ এবং মুহাম্মাদ ইসহাক এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হবার পূর্বে রসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলীকে (রা.) মদীনা তাইয়্যেবার তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে যাবার ফয়সালা করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুনাফিকরা বিভিন্ন ধরনের কথা বলতে থাকে। হযরত আলী (রা.) রসূলুল্লাহকে ﷺ বলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি আমাকে শিশু এবং নারীদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন? রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সান্তনা দিয়ে বলেছিলেন-আমার সাথে তোমার সম্পর্কতো মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। অর্থাৎ তুর পর্বতে যাবার সময় হযরত মূসা (আ) যেমন বনী ইসরাঈলদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

হযরত হারুনকে পেছনে রেখে গিয়েছিলেন অনুরুপভাবে মদীনার হেফাজতের জন্য আমি তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ মনে এই সন্দেহও জাগে যে, হযরত হারুনের সঙ্গে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়তো পরে এ থেকে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। কাজেই পরমুহুর্তেই তিনি কথাটা স্পষ্ট করে দেন এই বলে যে, “আমার পর আর কোন ব্যক্তি নবী হবে না।”

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ....وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى ثَلاَثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ (يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى-)ابو داود – كتاب الفتن(

হযরত সাওবান বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আর কথা হচ্ছে এই যে, আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমার পর আর কোন নবী নেই।

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আর একটি হাদীস আবু দাউদ ‘কিতাবুল মালাহেমে’ হযরত আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও হযরত সাওবান এবং হযরত আবু হুরাইরা ﷺ থেকে এ হাদীস দু’টি বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাটির শব্দ হলো এই-

-حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيب مِنْ ثَلاَثِيْنَ ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ

অর্থাৎ এমন কি ত্রিরিশ জনের মতো প্রতারক আসবে। তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রসূল।

(12) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاءَ ، فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِى مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَرُ-)بخارى ,كتاب المناقب(

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে অনেক লোক এমন ছিলেন, যাদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, অথচ তারা নবী ছিলেন না। আমার উম্মাতের মধ্যে যদি এমন কেউ হয়, তাহলে সে হবে উমর।

মুসলিমে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত যে হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, তাতেيكلمون এর পরিবর্তে محدثون শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মুকাল্লাম এবং মুহাদ্দাস শব্দ দু’টি সমার্থক। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার সঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কথা বলেছেন অথবা যার সাথে পর্দার পেছন থেকে কথা বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, নবুওয়াত ছাড়াও যদি এই উম্মাতের মধ্যে কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করতো তাহলে তিনি একমাত্র হযরত উমরই হতেন।

(13) – قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِى وَلاَ أُمَةَ بَعْدَ أُمَّتِى)بيهقى ,كتاب الرؤيا طبرانى(

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমার পরে আর কোন নবী নেই এবং আমার উম্মাতের পর আর কোন উম্মাত (অর্থাৎ কোন ভবিষ্যত নবীর উম্মাত) নেই।

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّى آخِرُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدِى آخِرُ الْمَسَاجِدِ-)مسلم ,كتاب (14) الحج .باب فضل الصلواة بمسجد مكة والمدينة(

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমি শেষ নবী এবং আমার মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী) শেষ মসজিদ। ১

রসূলুল্লাহর ﷺ নিকট থেকে বহু সাহাবী হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য সনদসহ এগুলো উদ্ধৃত করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দের ব্যবহার করে একথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, তিনি শেষ নবী। তার পর কোন নবী আসবে না। নবুওয়াতের সিলসিলা তার ওপর খতম হয়ে গেছে এবং তার পরে যে ব্যক্তি রসূল অথবা নবী হবার দাবী করবে, সে হবে দাজ্জাল (প্রতারক) এবং কাজ্জাব ও মিথ্যুক। ২ কুরআনের "খাতামুন নাবিয়্যীন" শব্দের এর চাইতে বেশী শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্যএবং প্রামান্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে! রসূলুল্লাহর বাণীই এখানে চরম সনদ এবং প্রমাণ। উপরন্তু যখন তা কুরআনের একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে তখন আরো অধিক শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই যে, মুহাম্মাদের ﷺ চেয়ে বেশী কে কুরআনকে বুঝেছে এবং তার চাইতে বেশী এর ব্যাখ্যার অধিকার কার আছে? এমন কে আছে যে খতমে নবুওয়াতের অন্য কোন অর্থ বর্ণনা করবে এবং তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করতেও আমরা প্রস্তুত হবো?

১. খতমে নবুওয়াত অস্বীকারীরা এ হাদীস থেকে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ ﷺ যেমন তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ বলেছেন, অথচ এটি শেষ মসজিদ নয়; এরপরও দুনিয়ার বেশুমার মসজিদ নির্মিত হয়েছে অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন যে, তিনি শেষ নবী। এর অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরেও নবী আসবেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তিনি হলেন শেষ নবী এবং তাঁর মসজিদ শেষ মসজিদ। কিন্তু আসলে এ ধরনের বিকৃত অর্থই একথা প্রমাণ করে যে, এ লোকগুলো আল্লাহ এবং রসূলের কালামের অর্থ অনুধাবন করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিম শরীফের যে স্থানে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সেখানে এ বিষয়ের সমস্ত হাদীস সম্মুখে রাখলেই একথা পরিষ্ফুট হবে যে, রসূল্লাহ ﷺ তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ কোন্ অর্থে বলেছেন। এখানে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহইবনে উমর (রাঃ) এবং হযরত মায়মুনার (রাঃ) যে বর্ণনা ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, দুনিয়ার মাত্র তিনটি মসজিদ এমন রয়েছে যেগুলো সাধারণ মসজিদগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। সেখানে নামায পড়লে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী সওয়াব হাসিল হয় এবং এ জন্য একমাত্র এ তিনটি মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করা জায়েয। দুনিয়ার অবশিষ্ঠ মসজিদগুলোর মধ্যে সমস্ত মসজিদকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে একটি সমজিদে নামায পড়বার জন্য সেদিকে সফর করা জায়েয নয়। এর মধ্যে মসজিদুল হারাম হলো প্রথম মসজিদ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এটি বানিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টি মদীনা তাইয়েবার মসজিদে নববী। এটি নির্মাণ করেন রসূলুল্লাহ (সাঃ)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদের অর্থ হলো এই যে, এখন যেহেতু আমার পর আর কোন নবী আসবে না, সেহেতু আমার মসজিদের পর দুনিয়ার আর চতুর্থ এমন কোন মসজিদ নির্মিত হবে না, যেখানে নামায পড়ার সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বেশী হবে এবং সেখানে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সেদিকে সফর করা জায়েয হবে।

২. শেষ নবুওয়াতে অবিশ্বাসীরা নবী করিমের (সাঃ) হাদীসের বিপরীতে হযরত আয়েশার (রাঃ) বলে কথিত নিম্নোক্ত বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয় ঃ "বল নিশ্চয়ই তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন, একথা বলো না যে তার পর নবী

নেই।” প্রথমত নবী করিমের (সা;) সুস্পষ্ট আদেশকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার (রাঃ) উদ্ধৃতি দেয়া একটা ধৃস্টতা। অধিকন্তু হযরত আয়েশার (রা.) বলে কথিত উপরোক্ত উদ্ধৃতি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীস শাস্ত্রের কোন প্রমাণিক গ্রন্থেই হযরত আয়েশার (রা.) উপরোক্ত উক্তির উল্লেখ নেই। কোন বিখ্যাত হাদীস লিপিবদ্ধকারী এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ বা উল্লেখ করেনি। উপরোক্ত হাদীসটি ‘দুররি মানসূর’ নামক তাফসীর এবং ‘তাকমিলাহ মাজমা-উল-বিহার’ নামক অপরিচিত হাদীস সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে; কিন্তু এর উৎপত্তি বা বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কিছুই জানা নেই। রসূল (সা.)-এর সুস্পষ্ট হাদীস বর্ণনাকারীরা খুবই নির্ভরযোগ্য সূত্র ধেকে বর্ণনা করেছেন, তাকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার (রা.) উক্তির, যা দুর্বলতম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ চূড়ান্ত ধৃষ্টতা মাত্র।

সাহাবীদের ইজমা-

কুরআন এবং সুন্নাহর পর সাহাবায়ে কেরামের ইজমা বা মতৈক্য হলো তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহর ﷺ ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যেসব লোক নবুওয়াতের দাবী করে এবং যারা তাদের নবুওয়াত স্বীকার করে নেয়, তাদের সবার বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মুসাইলামা কাজ্জাবের ব্যাপারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে রসূলুল্লাহর ﷺ নবুওয়াত অস্বীকার করছিল না; বরং সে দাবী করেছিলযে, রসূলুল্লাহর নবুওয়াতে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের পূর্বে সে তার নিকট যে চিঠি পাঠিয়েছিল তার আসল শব্দ হলো এইঃ

مِن مُسَيلَمَةِ رَسُوْلُ اللهِ اِلى مُحمَّدِرَّسُولُ الله سَلاَمٌ عَلَيْكَ فَاِنِّى أُشْرِكْتُ فِى الْاَمْرِ مَعَكَ (طبری ,جلد 2,طبع مصر,399 صفحة)

“আল্লাহর রসূল মুসাইলামার তরফ হতে আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদের নিকট। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুওয়াতের কাজে শরীক করা হয়েছে।”

এছাড়াও ঐতিহাসিক তাবারী একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মুসাইলামার ওখানে যে আযান দেয়া হতো তাতে اشهد ان محمدا رسول الله শব্দাবলীও বলা হতো। এভাবে স্পষ্ট করে রিসালাতে মুহাম্মাদীকে স্বীকার করে নেবার পরও তাকে কাফের ও ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, বনু হোনায়ফা সরল অন্তকরণে তার ওপর ঈমান এনেছিল। অবশ্য তারা এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ নিজেই তাকে তার নবুওয়াতের কাজে শরীক করেছেন। এছাড়াও আর একটা কথা হলো এই যে, মদীনা তাইয়্যেবা থেকে এক ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং বনু হোনায়ফার নিকটে গিয়ে সে কুরআনের আয়াতকে মুসাইলামার নিকট অবতীর্ণ আয়াতরূপে পেশ করেছিল। (البداية والنهاية لابن كثير – جلدة صفحة 1) কিন্তু এ সত্ত্বেও সাহাবায়ে কেরাম তাকে মুসলমান বলে স্বীকার করেননি এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। অতঃপর একথা বলার যুযোগ নেই যে, ইসলাম বহির্ভূত হবার কারণে সাহাবীগণ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল। ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলেও তাদের যুদ্ধ বন্দীদেরকে গোলামে পরিণত করা যেতে পারে না। বরং শুধু মুসলমানই নয় জিম্মীও (অসুমলিম)

বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, গ্রেফতার করার পর তাকে গোলামে পরিণত করা জায়েয নয়। কিন্তু মুসাইলামা এবং তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ঘোষণা করেন যে, তাদের মেয়েদের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা ছেলেদেরকে গোলাম বানানো হবে এবং গ্রেফতার করার পর দেখা গেলো, সত্যি সত্যিই তাদেরকে গোলাম বানানো হয়েছে। হযরত আলী (রা.) তাদের মধ্য থেকেই জনৈক যুদ্ধ বন্দিনীর মালিক হন। এই যুদ্ধ বন্দিনীর গর্ভজাত পূত্র মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াই হলেন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে সবর্জন পরিচিত ব্যক্তি। (البداية والنهاية جلد 2- صفحه 316-320) এ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোন বিদ্রোহের অপরাধ ছিল না বরং সে অপরাধ ছিল এই যে, এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে নবুওয়াতের দাবী করে এবং অন্য লোকেরা তার নবুওয়াতের ওপর ঈমান আনে। রসূলুল্লাহর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই এই পদক্ষেপ গৃহীত হয়। এর নেতৃত্ব দেন হযরত আবু বকুর সিদ্দীক (রা.) এবং সাহাবীদের সমগ্র দলটি একযোগে তার নেতৃত্বাধীনে এ কাজে অগ্রসর হন। সাহাবীদের ইজমার এর চাইতে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে।

উম্মাতের সমগ্র আলেম সমাজের ইজমা-

শরীয়তে সাহাবীদের ইজমার পর চতুর্থ পর্যায়ের সবচাইতে শক্তিশালী দলিল হলো সাহাবীগণের পরবর্তী কালের আলেম সমাজের ইজমা। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক যুগের এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকার আলেম সমাজ হামেশাই এ ব্যাপারে একমত রয়েছেন যে, "মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে কোন ব্যক্তি নবী হতে পারে না এবং তার পর যে ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করবে এবং যে ব্যক্তি এই মিথ্যা দাবীকে মেনে নেবে, সে কাফের এবং মিল্লাতে ইসলামের মধ্যে তার স্থান নেই।"

এ ব্যাপারে কতিপয় প্রমাণ পেশ করছিঃ

১) ইমাম আবু হানীফার যুগে (৮০-১৫০ হি) এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করে এবং বলেঃ "আমাকে সুযোগ দাও, আমি নবুওয়াতের সংকেত চিহ্ন পেশ করব।"

একথা শুনে ইমাম সাহেব বলেনঃ যে ব্যক্তি এর কাছ থেকে নবুওয়াতের কোন সংকেত চিহ্ন তলব করবে সেও কাফের হয়ে যাবে। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ لَانَبِیَّ بَعْدِیْ "আমার পর আর কোন নবী নেই।"

২) আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হি) তাঁর বিখ্যাত কুরআনের তাফসীরে (ولكن رسول الله وخاتم النبين) আয়াতটির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ اَلَّذِیْ خَتَمَ اللنُّبُوَّةَ فَطُبِعَ عَلَيْهَا فَلَا تُفْتَحْ لَاحَدِ بَعْدَهُ اِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ- "যে নবুওয়াতকে খতম করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে কিয়ামত পর্যন্ত এর দরজা আর কারো জন্য খুলবে না।" (তাফসীরে ইবনে জারীর ২২ খন্ড ১২ পৃষ্ঠা।

৩) ইমাম তাহাবী (হি ২৩৯-৩২১) তার আকীদাতুস সালাফীয়া গ্রন্থে সালাফেসালেহীন (প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ সৎকর্মশীলগণ) এবং বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহেমাহুমুল্লাহর আকিদা বিশ্বাস বর্ণনা প্রসঙ্গে নবুওয়াত সম্পর্কিত এ বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করেছেন যে, "আর মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, নির্বাচিত নবী ও পছন্দনীয় রসূল এবং শেষ নবী, মুত্তাকীদের উম্মাত, রসূলদের সরদার

ও রব্বুল আলামীনের বন্ধু। আর তার পর নবুওয়াতের প্রত্যেকটি দাবী পথভ্রষ্টতা এবং প্রবৃত্তির লালসার বন্দেগী ছাড়া আর কিছুই নয়।" (শারহুত তাহাবীয়া ফিল আকীদাতিস সালাফিয়া, দারুল মাআরিফ মিসর, ১৫, ৮৭, ৯৬, ৯৭, ১০০ ও ১০২ পৃষ্ঠা।

৪) আল্লামা ইবনে হাজাম আন্দালুস (৩৮৪-৪৫৬) হি) লিখেছেনঃ নিশ্চয়ই রসূলুল্লাহ ইন্তেকালের পর অহীর সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। এর সপক্ষে যুক্তি এই যে, অহী আসে একমাত্র নবীর কাছে এবং মহান আল্লাহ বলেছেন, মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়। কিন্তু সে আল্লাহ রসূল এবং সর্বশেষ নবী (আল মুহাল্লা, প্রথম খন্ড ২৬ পৃষ্ঠা)